কম্পিউটার

গণকযন্ত্র বা **কম্পিউটার** (ইংরেজি: Computer *কম্‌পিউটার্‌*) হল এমন একটি যন্ত্র যা সুনির্দিষ্ট নির্দেশ অনুসরণ করে গাণিতিক গণনা সংক্রান্ত কাজ করতে পারে।

যদিও কম্পিউটারের যান্ত্রিক উদাহরণ মানব ইতিহাসে সংরক্ষিত রয়েছে, প্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটার মধ্য বিংশ শতাব্দীতে তৈরি করা হয়েছিল (১৯৪০–১৯৪৫)।

ইতিহাস

এমন একটি যন্ত্রের নির্মাণ ও ব্যবহারের ধারণা (যা কেবলমাত্র যান্ত্রিকভাবে, মানে যেকোনও রকম বুদ্ধিমত্তা ব্যতিরেকে, গাণিতিক হিসাব করতে পারে) প্রথম সোচ্চার ভাবে প্রচার করেন চার্লস ব্যাবেজ, যদিও তার জীবদ্দশায় তিনি এর প্রয়োগ দেখে যেতে পারেননি। কম্পিউটার বিজ্ঞানের সত্যিকার সূচনা হয় অ্যালান টুরিং এর প্রথমে তাত্ত্বিক ও পরে ব্যবহারিক গবেষণার মাধ্যমে। বর্তমান প্রযুক্তিতে কম্পিউটারের আবদানের অন্তরালে রয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ নিরলস পরিশ্রম, উদ্ভাবনী শক্তি ও গবেষনা স্বাক্ষর। প্রগৈতিহাসিক যুগে গননার যন্ত্র উদ্ভাবিত বিভিন্ন কৌশল/ প্রচেষ্টাকে কম্পিউটার ইতিহাস বলাযায়। প্রাচীন কালে মানুষ সংখ্যা বুঝানোর জন্য ঝিনুক, নুড়ি, দড়ির গিট ইত্যাদি ব্যবহার করত। পরবর্তিতে গননার কাজে বিভিন্ন কৌশল ও যন্ত্র ব্রবহার করে থাকলেও অ্যাবাকাস (Abacus) নামক একটি প্রাচীন গননা যন্ত্রকেই কম্পিউটারের ইতিহাসে প্রথম যন্ত্র হিসেবে ধরা হয়। অর্থাৎ অ্যাবাকাস থেকেই কম্পিউটারের ইতিহাসের শুভযাত্রা। অ্যাবাকাস ফ্রেমে সাজানো গুটির স্থান পরিবর্তন করে গননা করার যন্ত্র। খ্রিষ্ট পূর্ব ৪৫০/৫০০ অব্দে মিশরে/ চীনে গননা যন্ত্র জিসেবে অ্যাবাকাস তৈরি হয়।

১৬১৬ সালে স্কটল্যান্ডের গণিতবিদ জন নেপিয়ার (John Napier) গণনা কাজে ছাপা বা দাগ কাটাকাটি/ দন্ড ব্যবহার করেন । এসব দন্ড নেপিয়ার (John Napier) এর অস্থি নামে পরিচিত।

১৬৪২ সারে ১৯ বছর বয়স্ক ফরাসি বিজ্ঞানী ব্লেইজ প্যাসকেল (Blaise Pascal) সর্বপ্রথম যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর আবিষ্কার করেন। তিনি দাঁতযুক্ত চাকা বা গিয়ারের সাহায্যে যোগ বিয়োগ করার পদ্ধতি চালু করেন। ১৬৭১ সালের জার্মান গণিতবিদ হটফ্রাইড ভন লিবনিজ (Gottfried Von Leibniz) প্যাসকেলের যন্ত্রের ভিত্তিতে চাকা ও দন্ড ব্যবহার করে গণ ও ভাগের ক্ষমতাসম্পন্ন আরো উন্নত যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর তেরি করেন।। তিনি যন্ত্রটির নামদেন রিকোনিং যন্ত্র (Rechoning Mechine)। যন্ত্রটি তত্ত্বগত দিক দিয়ে ভাল হলেও যান্ত্রিক আসুবিধার জন্য জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি।

পরে ১৮২০ সালে টমাস ডি কোমার bjgtut(Tomas De Colmar) রিকোনিং যন্ত্রের অসুবিধা দূর করে লাইবানজের যন্ত্রকে জনপ্রিয় করে তোলেন।

এর পর ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের আধ্যাপক চার্লস ব্যাবেজ (Charles Babbage) ১৮২৩ সালে ডিফারেন্স ইঞ্জিন (Difference Engine) বা বিয়োগফল ভিত্তিক গননার যন্ত্র উদ্ভাবন করেন।

একটু সহজ করে বলা যায় -

কম্পিউটার (computer) শব্দটি গ্রিক কম্পিউট(compute)শব্দ থেকে এসেছে। compute শব্দের অর্থ হিসাব বা গণনা করা।আর computer শব্দের অর্থ গণনাকারী যন্ত্র।কিন্তু এখন আর কম্পিউটারকে শুধু গণনাকারী যন্ত্র বলা যায় না। কম্পিউটার এমন এক যন্ত্র যা তথ্যগ্রহণ করে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করে। দেশে প্রথম কম্পিউটার আসে ১৯৬৪ সালে।

কম্পিউটার সিস্টেম

সিস্টেম হলো কতগুলো ইন্টিগ্রেটেড উপাদানের সম্মিলিত প্রয়াস যা কিছু সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করে। কম্পিউটার সিস্টেমের উপাদানগুলো নিম্নরূপ :- ১. হার্ডওয়্যার, ২. সফট্ওয়্যার, ৩. হিউম্যানওয়্যার বা ব্যবহারকারী, ৪. ডেটা/ইনফরমেশন।

হার্ডওয়্যার (Hardware)

কম্পিউটারের বাহ্যিক আকৃতিসম্পন্ন সকল যন্ত্র, যন্ত্রাংশ ও ডিভাইসসমূহকে *হার্ডওয়্যার* বলে। কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারকে প্রাথমিকভাবে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

- ইনপুট যন্ত্রপাতি : কী-বোর্ড, মাউস, ডিস্ক, স্ক্যানার, কার্ড রিডার, ডিজিটাল ক্যামেরা ইত্যাদি।
- সিস্টেম ইউনিট : হার্ডডিস্ক, মাদারবোর্ড, এজিপি কার্ড ইত্যাদি।
- আউটপুট যন্ত্রপাতি : মনিটর, প্রিন্টার, ডিস্ক, স্পিকার ইত্যাদি।

সফট্ওয়্যার (software)

সমস্যা সমাধান বা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কম্পিউটারের ভাষায় ধারাবাহিকভাবে সাজানো নির্দেশমালাকে *প্রোগ্রাম* বলে। প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রাম সমষ্টি যা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও ব্যবহারকারীর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে হার্ডওয়্যারকে কার্যক্ষম করে তাকেই *সফট্ওয়্যার* বলে।

কম্পিউটারের সফট্ওয়্যারকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ক * সিস্টেম সফট্ওয়্যার : সিস্টেম সফট্ওয়্যার কম্পিউটারের বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে কাজের সমন্বয় রক্ষা করে ব্যবহারিক প্রোগ্রাম নির্বাহের জন্য কম্পিউটারের সামর্থ্যকে সার্থকভাবে নিয়োজিত রাখে। খ * অ্যাপ্লিকেশন সফট্ওয়্যার : ব্যবহারিক সমস্যা সমাধান বা ডেটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহিত প্রোগ্রামকে অ্যাপ্লিকেশন সফট্ওয়্যার বলে। ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক রকম তৈরি প্রোগ্রাম বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে পাওয়া যায়, যাকে সাধারণত প্যাকেজ প্রোগ্রামও বলা হয়।

হিউম্যানওয়্যার বা ব্যবহারকারী (Humanware)

ডেটা সংগ্রহ, প্রোগ্রাম বা ডেটা সংরক্ষণ ও পরীক্ষাকরণ, কম্পিউটার চালানো তথা প্রোগ্রাম লিখা, সিস্টেমগুলো ডিজাইন ও রেকর্ড লিপিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণ, সফট্ওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের মধ্যে সমন্বয় সাধন ইত্যাদি কাজগুলোর সাথে যুক্ত সকল মানুষকে একত্রে হিউম্যানওয়্যার (Humanware) বলা হয়।

ডেটা/ইনফরমেশন

ইনফরমেশন বা তথ্যের ক্ষুদ্রতম একককে ডেটা বলে। ডেটা হল সাজানো নয় এমন কিছু বিশৃঙ্খল ফ্যাক্ট (Raw Fact)ডেটা প্রধানত দুরকম -

(ক) নিউমেরিক (Numeric) ডেটা বা সংখ্যাবাচক ডেটা। যেমন – ২৫,১০০,৪৫৬ ইত্যাদি। (খ) অ-নিউমেরিক (Non-Numeric) ডেটা। যেমন – মানুষ, দেশ ইত্যাদির নাম, জীবিকা, জাতি কিংবা ছবি, শব্দ ও তারিখ প্রভৃতি।

অপারেটিং সিস্টেম

অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে এমন একটি সফ্টওয়্যার যা কম্পিউটার প্রোগ্রামের এক্সিকিউশনকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং যা সিডিউলিং, ডিবাগিং, ইনপুট/আউটপুট কন্ট্রোল, একাউন্টিং, কম্পাইলেশন, স্টোরেজ অ্যাসাইনমেন্ট, ডেটা ম্যানেজমেন্ট এবং আনুষঙ্গিক কাজ করে থাকে। বর্তমানে মাইক্রো কম্পিউটার বা পিসিতে বহুল ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেমগুলো হলো - PC DOS, MS WINDOWS 95/98/2000, UNIX,UBUNTU, LinuxMint, MANDRIVA, DEBIAN, Fedora, MAC OSX, WINDOWS XP, WINDOWS Vista, WINDOWS 7, Windows 8

প্রয়োগ

কম্পিউটারের রয়েছে প্রচুর ব্যাবহার| ঘরের কাজ থেকে শুরু করে ব্যাবসায়িক, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে এর অপরিসীম ব্যাবহার| সর্বোপরি যোগাযোগ ক্ষেত্রে এটি এনেছে অনন্য বিপ্লব| চিকিৎসা ও মানবকল্যানেও এটি এক অনন্য সঙ্গী| এক কথায় কম্পিউটার এমন এক যন্ত্র যা প্রায় সকল কাজ করতে সক্ষম।

কম্পিউটারের প্রকার

প্রয়োগের তারতম্যের ভিত্তিতে কম্পিউটারকে দুভাগে ভাগ করা যায়।

1. সাধারণ ব্যবহারিক কম্পিউটার।
2. বিশেষ ব্যবহারিক কম্পিউটার।

আবার কম্পিউটারের গঠন ও প্রচলন নীতির ভিত্তিতে একে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

1. এনালগ কম্পিউটার।
2. ডিজিটাল কম্পিউটার।
3. হাইব্রিড কম্পিউটার।

আকার, সামর্থ্য, দাম ও ব্যবহারের গুরুত্বের ভিত্তিতে ডিজিটাল কম্পিউটারকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায়।

1. মাইক্রো কম্পিউটার।
2. মিনি কম্পিউটার।
3. মেইনফ্রেম কম্পিউটার।
4. সুপার কম্পিউটার।

নিচে কম্পিউটারের পূর্ণাঙ্গ শ্রেণীবিভাগ দেখানো হলো :

এনালগ কম্পিউটার

যে কম্পিউটার একটি রাশিকে অপর একটি রাশির সাপেক্ষে পরিমাপ করতে পারে,তাই এনালগ কম্পিউটার। এটি উষ্ণতা বা অন্যান্য পরিমাপ যা নিয়মিত পরিবর্তিত হয় তা রেকর্ড করতে পারে।মোটর গাড়ির বেগ নির্ণায়ক যন্ত্র এনালগ কম্পিউটারের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

ডিজিটাল কম্পিউটার

ডিজিটাল কম্পিউটার দুই ধরনের বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ দ্বারা সকল কিছু প্রকাশ করা হয়। ভোল্টেজের উপস্থিতিকে ১ এবং অনুপস্থিতিকে ০ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটি যে কোন গণিতের যোগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে এবং বিয়োগ,গুণ ও ভাগের মতো অন্যান্য অপারেশন যোগের সাহায্যে সম্পাদন করে। আধুনিক সকল কম্পিউটার ডিজিটাল কম্পিউটার।

হাইব্রিড কম্পিউটার

হাইব্রিড কম্পিউটার হলো এমন একটি কম্পিউটার যা এনালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যগুলোর সমন্বয়ে গঠিত। এটি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যবহার করা হয়। সুতরাং বলা যায়, প্রযুক্তি ও ভিত্তিগত দিক থেকে এনালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের আংশিক সমন্বয়ই হচ্ছে হাইব্রিড কম্পিউটার। সাধারণত হাইব্রিড কম্পিউটারে তথ্য সংগ্রহ করা হয় অ্যানালগ পদ্ধতিতে এবং গণনা করা হয় ডিজিটাল পদ্ধতিতে। যেমন আবহাওয়া দপ্তরে ব্যবহৃত হাইব্রিড কম্পিউটার অ্যানালগ পদ্ধতিতে বায়ুচাপ,তাপ ইত্যাদি পরিমাপ করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে গণনা করে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিয়ে থাকে।

মিনি কম্পিউটার

যে কম্পিউটার টার্মিনাল লাগিয়ে প্রায় এক সাথে অর্ধ শতাধিক ব্যবহারকারী ব্যবহার করতে পারে তাই মিনি কম্পিউটার। এটা শিল্প-বাণিজ্য ও গবেষণাগারে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।যেমন – pdp-11,ibms/36,ncrs/9290.

মাইক্রো কম্পিউটার

মাইক্রো কম্পিউটারকে পার্সোনাল কম্পিউটার বা পিসি বলেও অভিহিত করা হয়। ইন্টারফেস চিপ (Mother Board) , একটি মাইক্রোপ্রসেসর cpu, ram, rom, hard disk etc. সহযোগে মাইক্রো কম্পিউটার গঠিত হয়। দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে এ কম্পিউটারের ব্যবহার দেখা যায়।ম্যকিনটোস আইবিএম পিসি এ ধরনের কম্পিউটার।

সুপার কম্পিউটার

অত্যন্ত শক্তিশালী ও দ্রুতগতিসম্পন্ন কম্পিউটারকে সুপার কম্পিউটার বলে। এ কম্পিউটারের গতি প্রায় প্রতি সেকেন্ডে ১ বিলিয়ন ক্যারেক্টর। নো দেশের আদমশুমারির মতো বিশাল তথ্য ব্যবস্থাপনা করার মতো স্মৃতিভান্ডার বিশিষ্ট কম্পিউটার হচ্ছে সুপার কম্পিউটার। CRAY 1, supers xll এ ধরনের কম্পিউটার।

ট্যাবলেট কম্পিউটার

ট্যাবলেট কম্পিউটার এক ধরণের মাইক্রো কম্পিউটার। যা পাম টপ কম্পিউটার নামে পরিচিত। এটি স্পর্শপর্দা সম্বলিত প্রযুক্তি। এটি এন্ড্রোয়েড এবং উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে চলে।

ডেটাবেজ

একটি **ডেটাবেজ** (ইংরেজি: Database) হল কোন কম্পিউটার সিস্টেমে সঞ্চিত উপাত্ত বা রেকর্ডসমূহের একটি কাঠামোবদ্ধ সংগ্রহ। উপাত্তকে একটি উপাত্ত মডেল অনুসারে সাজিয়ে এই কাঠামোটি অর্জন করা হয়। বর্তমানে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত উপাত্ত মডেল হল সাম্পর্কিক বা রিলেশনাল মডেল। অন্যান্য মডেল, যেমন স্তরক্রমিক বা হায়ারার্কিকাল মডেল এবং নেটওয়ার্ক মডেল, উপাত্তসমূহের মধ্যকার সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে উপস্থাপন (explicit representation) করে।

ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

ডাটাবেজ মানে তথ্যভান্ডার। কম্পিউটার আবিষ্কারের আগে স্তুপীকৃত ফাইলে তথ্য সংরক্ষণ করা হতো, এখন ডেটাবেজে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। ডাটাবেজ তৈরীর বিভিন্ন প্রোগ্রাম আছে। একটি ডাটাবেজ তৈরী করার পর সেটাকে প্রায়ই আপডেট করতে হয়। এই আপডেটের কাজ করার জন্যও বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম আছে। ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ডিবিএমএস, হলো এমন একটি পূর্ণাঙ্গ প্রোগ্রাম যা একই সাথে ডাটাবেজ তৈরী, ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বধান এবং ডাটা প্রসেসের কাজ করে। ডাটাবেজের সাহায্যে ডাটা প্রসেস করে আমরা ঐসব ডাটার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারি। যদিও ডাটা প্রসেস করে নলেজ মাইন করা ডাটাবেজের মুল উদ্দেশ্য নয়। নলেজ মাইনিংয়ের জন্য ডাটা মাইনিং টুলস ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ডাটাবেজের মুল উদ্দেশ্য হলো, দ্রুত গতিতে ডাটা খোঁজ করা, সবচেয়ে নিরাপদ উপায়ে ডাটা সংরক্ষণ করা ইত্যাদি। ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সেই সমস্ত ক্ষেত্রে অপরিহার্য যেখানে একই সময় একাধিক ব্যবহারকারী একই ডাটা ব্যবহার করে থাকেন। যেমন, একটি ব্যাংকের একাধিক শাখায় অবস্থিত কর্মকর্তারা যদি একই তথ্য, একই সময়ে আপডেট করতে চান, তখন বিভিন্ন সমস্যার তৈরী হতে পারে। ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, এই সমস্যাগুলোকে খুবই দক্ষতার সাথে সামাল দেয়। কিছু জনপ্রিয় ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হল ওরাকল, এসকিউএল, এসকিউএল-লাইট, পোস্টজিআরই-এসকিউএল, মাইক্রোসফট এসকিউএল সার্ভার, আইবিএম ডিবি২, মাইক্রোসফট এক্সেস। একটি ডাটাবেস বিভিন্ন রকমের ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ব্যবহার করা যায়না তবে এসকিউএল সহ কিছু স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করে একই অ্যাপ্লিকেশনে বিভিন্ন সিস্টেম একসাথে ব্যবহার করা যায়।

কম্পিউটার আবিষ্কার এবং এর ব্যবহারের শুরুর দিকেই তথ্য তৈরী, সংরক্ষণ এবং খোঁজার কাজটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো। সর্বপ্রথম ১৯৬০ সালে, বিখ্যাত কম্পিউটার বিজ্ঞানী চার্লস বাকম্যান ডিবিএমএস তৈরী করেন। তিনি তখন জেনারেল ইলেট্রিকে কর্মরত ছিলেন। সেই ডিবিএমএসটির নাম দেয়া হয়েছিলো, ইন্টিগ্রেটেড ডাটা স্টোর(আইডিএস) । ষাটের দশকের শেষের দিকে আইবিএম ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নামে একটি ডিবিএমএস তৈরী করে। এই সফটওয়্যারটিই, তথ্যকে শ্রেনীক্রম অনুসারে কিভাবে সাজানো যায় তার একটি ধারনা দিয়েছিলো, যা বর্তমানে হায়ারারকিকাল ডাটা মডেল নামে পরিচিত। ১৯৭০ সালে এটস্থার কড, তথ্যকে পরিবেশন করার নতুন একটা মডেলের প্রস্তাব দেন। তিনি তখন আইবিএম'র স্যান হোস গবেষণাগারে কর্মরত ছিলেন। এই ধারনাটিই রিলেশনাল ডাটা মডেল নামে পরিচিত। ডিবিএমসের ক্রমবিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শুরু হয়, ইন্টারনেটের আবিষ্কার এবং এর বহুল ব্যবহারের পর থেকে। এখন ওয়েবসাইট ভিত্তিক ডাটাবেজকে উন্নত করার জন্য নানা ধরনের গবেষণা চলছে।

ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহারের সুবিধা

1. একই তথ্যের পুনরাবৃত্তি রোধ করে স্থানের সর্বোচ্চ ব্যবহার। ধরা যাক, একটি স্কুলের ডাটাবেজে, তিন ধরনের টেবিল আছে। প্রথম টেবিলে, শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার রেজাল্ট সংক্রান্ত তথ্য । দ্বিতীয় টেবিলে তাদের বেতন সম্পর্কিত তথ্য । তৃতীয় টেবিলে তাদের ব্যক্তিগত তথ্য। দেখা যাবে, প্রতিটি টেবিলেই, শিক্ষার্থীদের নাম উল্লেখ করতে হচ্ছে। অথচ, ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করে আমরা শুধু মাত্র এক যায়গায় শিক্ষার্থীদের নাম সংরক্ষন করে, পরবর্তীতে ঐ জায়াগার রেফারেন্স দিয়ে দিতে পারি।

2. তথ্যের অসামঞ্জস্যতা দুর করা। বিচ্ছিন্নভাবে সংরক্ষিত তথ্যে বিভ্রাট বা যৌক্তিক অসামঞ্জস্যতা থাকতে পারে। ডিবিএমএসে তথ্য সংরক্ষণ করা হলে, তথ্যের যেকোন ধরনের অসামঞ্জস্যতা সনাক্ত করা যায়। যেমন, একই ব্যক্তির ছবির শিরোনাম ভিন্ন হতে পারে না। দেখা গেলো, একই রকম ছবি বা তথ্য জমা দিয়ে, দুজন ভিন্ন ব্যক্তি, দুটো ভিন্ন নাম ব্যবহার করলো। ডিবিএমএস ব্যবহারের মাধ্যমে তা সনাক্ত করা সম্ভব।

3. একই সময়ে একাধিক ব্যবহারকারী একই তথ্য নিয়ে কাজ করতে সক্ষম

4. তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তথ্য নবায়ন করার পর, সংরক্ষণের আগেই যেনো তা মুছে না যায় তা নিশ্চিত করা। যেমন, কোন তথ্যভান্ডারে ২০০ ডাটা নবায়ন করার পর, সংরক্ষণের আগেই বিদ্যুৎ চলে যেতে পারে। এই সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা ডিবিএমএস এ আছে। ডিবিএমএস তথ্যের যেকেনো পরিবর্তনের সুচী তৈরী করে রাখে। যখন প্রয়োজন হয়, তখন স্বল্পমেয়াদের জন্য তৈরীকৃত ঐসব সুচীর মাধ্যমে তথ্য উদ্ধার করা হয়।

5. তথ্যের স্বনির্ভরতা তৈরী করা। এর মানে হলো, তথ্য যেন তথ্য ব্যবস্থাপনা প্রোগ্রামের ওপর নির্ভর না হয়। তাতে সুবিধা হবে এই যে, এক ডিবিএমএসএ তৈরী করা তথ্য অন্য ডিবিএমএস এ ব্যবহার করা যাবে।

6. স্বল্পতম সময়ে তথ্য খুঁজে বের করা।

7 . সহজে এবং কম সময়ে ডাটাবেজ বা তথ্যভান্ডার তৈরী করা

ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং

ব্যাংকে কম্পিউটার প্রচলনের পূর্বে নির্ধারিত অফিস সময়ের মধ্যে ব্যাংকিং কার্য্যক্রম শেষ করতে হত। তথ্য প্রযুক্তির আশীর্বাদে এখন গ্রাহকগন দিনে ২৪ ঘন্টা, বছরে ৩৬৫ দিনই ব্যাংকিং সুবিধা পাচ্ছেন। এখন একজন গ্রাহক যে কোন সময় এটিএম (ATM) বুথ থেকে টাকা উঠাতে পারেন এবং তৎক্ষনাৎই তার একাউন্টের ব্যালেন্স আপ-টু-ডেট হয়ে যাচ্ছে এবং ব্যাংক কর্মকর্তাগণ যথারীতি সমস্ত রিপোর্ট পেয়ে যাচ্ছেন। একজন গ্রহক যে কোন সময় ইন্টারনেট ব্যাংকিং ব্যবস্থা ব্যবহার করে ঘরে বা অফিসে বসে কিছু ব্যাংকিং সেবা নিতে পারেন। দোকানে কেনা কাটা করে যে কোন সময় কার্ড ও পস (POS) টার্মিনাল ব্যবহার করে বিল পরিশোধ করতে পারেন। মোবাইল ফোন ব্যবহার করেও দিনে ২৪ ঘন্টা, বেশকিছু লেনদেন করা যায়।

তথ্য প্রযুক্তি প্রচলনের পূর্বে ব্যাংকিং সেবায় জন্য গ্রাহকদেরকে যে কোন শাখায় স্বশরীরে যেতে হত। তথ্য প্রযুক্তির সুবাদে গ্রাহকবৃন্দ কোন শাখায় না গিয়েও বেশ কিছু ব্যাংকিং সেবা পেতে পারেন। যেমন এটিএম বুথ থেকে টাকা উঠানো বা টাকা জমা দেওয়া, বিল প্রদান, টাকা স্থানান্তর, ব্যালেন্স দেখা, যে কোন দোকান, হোটেল বা রেস্টুরেন্টে কার্ড ও পস টার্মিনাল ব্যবহার করে বিল পরিশোধ করা, বিশ্বের যে কোন স্থানে থেকে ইন্টারনেট ব্যাংকিং পদ্ধতির মাধ্যমে উপরোক্ত ব্যাংকিং কার্য্যাদি সম্পাদন করা, মোবাইল ফোন ব্যবহার করে দেশের অভ্যন্তরীন যে কোন স্থান থেকে কিছু ব্যাংকিং কার্য্যাদি সম্পাদন করা যাচ্ছে। এ সবই সম্ভব হয়েছে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার কল্যাণে।

ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং হল এমন একটি আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে একজন গ্রাহক ব্যাংকের শাখায় কোন কর্মকর্তার সাহায্য ছাড়াই বেশকিছু নির্ধারিত সেবা পেতে পারেন। এক্ষেত্রে গ্রাহককে স্বশরীরে ব্যাংকের শাখায় যেতে হয় না। বাংলাদেশে প্রচলিত ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং সেবাসমূহের একটি চিত্র নিচে দেওয়া হল:

১। অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম)

ব্যাংকিং সেবা গ্রাহকদের কাছাকাছি পৌঁছে দেওয়ার নিমিত্তে ব্যাংকসমূহ দেশের বিভিন্ন শহরে এবং শহরের বিভিন্ন স্থানে এটিএম স্থাপন করেছে। এতে ব্যাংকিং সেবা পাওয়ার জন্য গ্রাহকগনকে দূরবর্তী ব্যাংকে যেতে হয় না। তাছাড়া, এটিএমসমূহ দিনে ২৪ ঘন্টা ও বছরে ৩৬৫ দিনই চালু থাকে। ফলে গ্রাহকগণ রাত-দিন, বছরের সকল দিনে এমনকি ছুটির দিনেও এটিএম বুথ থেকে বেশ কিছু সেবা গ্রহণ করতে পারেন।
ব্যাংকের গ্রাহকগণ একটি এটিএম বুথ থেকে নিম্নবর্ণিত সেবাসমুহ পেতে পারেন:
ক) টাকা উত্তোলন,
খ) ইউটিলিটি বিল প্রদান,
গ) এক একাউন্ট থেকে অন্য একাউন্টে টাকা স্থানান্তর,
ঘ) একাউন্টের ব্যালেন্স দেখা,
ঙ) একাউন্টের মিনি স্টেটমেন্ট ছাপানো।

কোন কোন এটিএম-এর মাধ্যমে নগদ টাকা জমা দেওয়া ও চেক জমা দেওয়া যায়। আবার কোন কোন এটিএম বুথে টাকা জমা দেওয়ার জন্য আলাদা ডিপোজিট মেশিন থাকে যার মাধ্যমেও টাকা বা চেক জমা দেওয়া যায়। এটিএম মেশিন থেকে নির্ধারিত সেবাসমূহ গ্রহণের জন্য ব্যাংক গ্রাহকদের একটি কার্ড ও পিন (PIN) প্রদান করে থাকে। এই কার্ডকে এটিএম কার্ড বা ডেবিট কার্ড বলে। পিন হল পারসোনাল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার (Personal Identification Number) বা গোপনীয় নম্বর। গ্রাহক ঐ কার্ডটি এটিএম-এর নির্ধারিত স্লটে ঢুকিয়ে পিন টাইপ করে ঐ সমস্ত সেবা গ্রহণ করে থাকেন। এটিএম থেকে গ্রাহক ঐ পিন পরিবর্তনও করতে পারেন। তাছাড়া ক্রেডিট কার্ড ও পিন ব্যবহার করেও গ্রাহক এটিএম থেকে টাকা উঠাতে পারেন। বর্তমানে বাংলাদেশে ৩,৫০০ এর উপর এটিএম রয়েছে যার মধ্যে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের রয়েছে ১৮০০টি।

২। পয়েন্ট অফ সেল বা পস (POS) টার্মিনাল

ব্যাংক বিভিন্ন দোকানে, প্রতিষ্ঠানে, হোটেল বা রেস্টুরেন্টে পস টার্মিনাল প্রদান করে থাকে। গ্রাহক ঐ সমস্ত স্থানে কেনাকাটা বা সার্ভিস গ্রহণ করে পস টার্মিনালের মাধ্যমে বিল প্রদান করে থাকেন। পস টার্মিনালের মাধ্যমে বিল পরিশোধের জন্য গ্রাহক তার ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডটি বিক্রেতার কাছে দেন। বিক্রেতা পস টার্মিনালে ঐ কার্ডটি সোয়াইপ (Swipe) করে বা ইনসার্ট করে টাকার অংক টাইপ করে "এন্টার" বাটন চাপলে ব্যাংকের সার্ভারে গ্রাহকের একাউন্ট ডেবিট হয়ে প্রাপকের একাউন্টটে ঐ পরিমাণ টাকা ক্রেডিট হয়ে যায়। ডেবিট কার্ড হলে গ্রাহক পিন দিয়ে লেনদেনটি সম্পন্ন করেন, আর ক্রেডিট কার্ড হলে তিনি একটি স্লিপে স্বাক্ষর করে তা অনুমোদন করেন। বিক্রেতা ঐ স্বাক্ষরটি কার্ডের পিছনে অবস্থিত গ্রাহকের স্বাক্ষরের সাথে মিলিয়ে নেন। বাংলাদেশে ১৩,০০০ এর উপর পস টার্মিনাল রয়েছে। দি সিটি ব্যাংক, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, ব্রাক ব্যাংক প্রত্যেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পস টার্মিনাল বিভিন্ন দোকান ও প্রতিষ্ঠানে স্থাপন করেছে।

৩। ইন্টারনেট ব্যাংকিং

গ্রাহক ঘরে বা অফিসে বসে ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বেশ কিছু ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারেন। এই সমস্ত সার্ভিসের জন্য গ্রাহকের একটি কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ থাকতে হবে এবং ব্যাংক থেকে ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর পাসওয়ার্ড নিতে হয়। গ্রাহক ব্যাংকের ওয়েবসাইটে গিয়ে "ইন্টারনেট ব্যাংকিং" আইকনে ক্লিক করেন, অত:পর আই.ডি এবং পাসওয়ার্ড টাইপ করে "ইন্টারনেট ব্যাংকিং"-এর মেনুতে প্রবেশ করেন। এইসব মেনু থেকে গ্রাহক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবেন:
ক) ব্যালেন্স চেক করা।

খ) একাউন্ট স্টেটমেন্ট দেখা বা প্রিন্ট করা বা ডাউনলোড করা।
গ) এক একাউন্ট থেকে অন্য একাউন্টে টাকা স্থানান্তর করা।
ঘ) ইউটিলিটি বিল প্রদান করা।
ঙ) স্কুল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি দেওয়া।
চ) স্টান্ডিং স্টেটম্যান্ট তৈরী করা।
ছ) এফ.ডি.আর খোলা বা ভাঙ্গানো ।
জ) এল.সি-র জন্য আবেদন করা।

তাছাড়া চেকের জন্য অনুরোধ করা, কোন চেক হারিয়ে গেলে তা "স্টপ পেমেন্ট" করা, ইন্টারেস্ট রেট চেক করা, মুদ্রার বিনিময় হার দেখা, কোন একটি চেক ক্লিয়ারিং-এর মাধ্যমে ক্লিয়ার হল কিনা তা দেখা, ঋণ সুবিধার জন্য দরখাস্ত করা ইত্যাদি কাজ সমূহ ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায়। উল্লেখ্য যে, ইন্টারনেট ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে গ্রাহক নগদ টাকা উত্তোলন বা জমা দিতে পারেন না।

বাংলাদেশে অনেক ব্যাংকই এখন ইন্টারনেট ব্যাংকিং সেবা গ্রাহকদের প্রদান করছে। এর মধ্যে- ডাচ্-বাংলা ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, ব্রাক ব্যাংক, ইস্টার্ন ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক, দি সিটি ব্যাংক এর ইন্টারনেট ব্যাংকিং উল্লেখযোগ্য।

৪। এস.এম.এস ব্যাংকিং
এসএমএস ব্যাংকিং-এর জন্য ব্যাংক তার গ্রাহককে একটি পিন প্রদান করে থাকে। গ্রাহক কিছু কী-ওয়ার্ড ও ঐ পিন ব্যবহার করে ব্যাংকের নির্ধারিত শর্ট কোডে একটি এসএমএস পাঠালে ব্যাংক থেকে তৎক্ষনাৎ ফিরতি এসএমএস-এর মাধ্যমে গ্রাহককে প্রত্যাশিত তথ্যাবলী জানানো হয় বা নির্দেশিত কাজটি করে তা গ্রাহককে জানিয়ে দেয়। যেমন ব্যাংকের "শর্ট কোড ৩২২৫" এবং গ্রাহকের পিন ১২৩৪ হলে গ্রাহক তার রেজিস্ট্রিকৃত মোবাইল থেকে নিম্নলিখিত এসএমএস-টি ৩২২৫ নম্বরে পাঠালে গ্রাহক তার একাউন্টের ব্যালেন্স জানতে পারবেন:

BAL 1234

এবং নিম্নবর্ণিত এসএমএস-টি পাঠালে উল্লেখিত মোবাইলের বিপরীতে ১২০০/- টাকা বিল পরিশোধ হয়ে যাবে;

Pay 1234 1200.00 01211223344

অনেক ব্যাংকই এসএমএস ব্যাংকিং চালু করেছে। তবে এটি গ্রাহকদের কাছে তেমন জনপ্রিয় হতে পারেনি।

৫। এলার্ট ব্যাংকিং
গ্রাহকের মোবাইল এলার্ট ব্যাংকিং-এর জন্য রেজিস্ট্রার্ড করা থাকলে তার একাউন্টে যখনই কোন ডেবিট বা ক্রেডিট ট্রানজেকশন হবে, তখনই ঐ সংক্রান্ত একটি এসএমএস তার ঐ মোবাইলে চলে আসবে।
এটি গ্রাহকের একাউন্টে জালিয়াতি প্রতিরোধে সাহায্য করে। তাছাড়া বিভিন্ন কোম্পানীর কর্মকর্তারা এর মাধ্যমে জানতে পারেন কখন তাদের একাউন্টে বেতনের টাকা জমা হল। বিদেশ থেকে আগত রেমিটেন্স গ্রাহকদের একাউন্টে জমা হওয়ার বার্তাও এর মাধ্যমে গ্রাহক জানতে পারেন। এটি গ্রাহকদের মাঝে খুবই জনপ্রিয়।

৬। আই.ভি.আর (IVR)
আই.ভি.আর হল "ইন্টারএকটিভ ভয়েস রিসপন্স"-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। গ্রাহক যে কোন ল্যান্ডফোন বা মোবাইল ফোন থেকে ব্যাংকের নির্দিষ্ট একটি শর্ট কোডে ফোন করলে আইভিআর কলটি গ্রহন করে কিছু অপশন শোনাবে। যেমন, একাউন্ট সার্ভিসের জন্য ১ চাপুন, কার্ড সার্ভিসের জন্য ২ চাপুন ইত্যাদি। আপনি ১ চাপলে আইভিআর জানাবে একাউন্টের ব্যালেন্স জানার জন্য ১ চাপুন, ফান্ড ট্রান্সফারের জন্য ২ চাপুন, চেক বই পাওয়ার জন্য ৩ চাপুন ইত্যাদি।

আপনি ১ চাপলে আইভিআর থেকে একাউন্ট নম্বরটি ফোন থেকে এন্ট্রি দেওয়ার জন্য বলে। তারপর আপনার আইভিআর সার্ভিসের জন্য প্রদেয় পিনটি এন্টি দেওয়ার জন্য বলবে। একাউন্ট নম্বর ও পিন সঠিক হলে একাউন্টের ব্যালেন্স পড়ে শোনাবে ।

সুতরাং আইভিআর হল এমন একটি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি যার মাধ্যমে একজন গ্রাহক তার ল্যান্ড বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে একটি যন্ত্রের সাথে তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে তার ব্যাংক একাউন্ট সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানতে পারবেন বা কোন অনুরোধ প্রেরণ করতে পারেন বা কিছু লেনদেন সম্পন্ন করতে পারেন।

ডাচ্-বাংলা ব্যাংক ও ব্রাক ব্যাংকের কল সেন্টারের মাধ্যমে প্রদত্ত আইভিআর সার্ভিস উল্লেখযোগ্য।

৭। অন-লাইন ব্যাংকিং
পৃথিবীর কোন কোন দেশে অন-লাইন ব্যাংকিং বলতে ইন্টারনেট ব্যাংকিং-কে বুঝায়। কিন্তু আমাদের দেশ সহ বেশ কিছু দেশে অন-লাইন ব্যাংকিং বলতে একটি ব্যাংকের সকল শাখাসমূহকে নেটওয়ার্ক-এর অন্তর্ভূক্ত করে একটি কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যার-এর আওতায় নিয়ে আসাকে বোঝায়, যাতে গ্রাহকগণ তার একাউন্ট যে শাখায়ই থাকুক না কেন, সকল শাখা থেকে সকল ব্যাংকিং কার্য্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। এই ব্যবস্থাকে ''এনি ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং''-ও বলা হয়।

বাংলাদেশে প্রায় সকল ব্যাংকই অন-লাইন ব্যাংকিং চালু করেছে।

৮। এম-কমার্স

এম-কমার্স বা মোবাইল কমার্স হল এমন একটি ব্যাংকিং পদ্ধতি যেখানে গ্রাহক তার মোবাইল ফোন ব্যবহার করে তার মোবাইল একাউন্ট থেকে টাকা উঠানো, টাকা জমা দেওয়া, এক একাউন্ট থেকে অন্য একাউন্টে (P2P) টাকা স্থানান্তর করা, বিদেশ থেকে প্রেরিত টাকা গ্রহণ করা, দোকানে কেনাকাটার বিল দেওয়া, ইউটিলিটি বিল প্রদান করা, মাসিক বেতন ও ভাতা গ্রহণ করা, সরকারী ট্যাক্স প্রদান সহ অন্যান্য কাজ করতে পারেন।

ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত যে কোন এজেন্টের মাধ্যমে KYC (Know Your Customer) ফরম পূরণ করেই অতি সহজে একটি মোবাইল একাউন্ট খোলা যায়। ব্যাংক দেশের সর্বত্র ছোট ছোট দোকানকে এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ দিতে পারে। এই এজেন্টদেরকে ক্যাশ পয়েন্ট (Cash Point) ও বলা হয়। গ্রাহকগণ যে কোন এজেন্টের মাধ্যমে তার একাউন্টে টাকা জমা দেয়া বা তার একাউন্ট থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারেন। তিনি বাসায়, অফিসে বা গাড়ীতে বসেই মোবাইল ফোন ব্যবহার করে তার একাউন্ট থেকে অন্য যে কোন মোবাইল একাউন্টে টাকা পাঠাতে পারেন।

বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী লোকজন তাদের আত্মীয়-স্বজনের মোবাইল নম্বর উল্লেখ করে ঐ একাউন্টে টাকা পাঠাতে পারেন। দেশে অবস্থিত আত্মীয়-স্বজন নিকটস্ত এজেন্টের কাছ থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারেন।

গ্রাহক কোন দোকান থেকে কিছু কিনে নগদ টাকা না দিয়ে মোবাইলের মাধ্যমে তার একাউন্ট থেকে দোকানদারের একাউন্টে টাকা স্থানান্তরের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করতে পারেন। তেমনি গ্রাহকের একাউন্ট থেকে ইউটিলিটি কোম্পানীর একাউন্টে টাকা স্থানান্তরের মাধ্যমে একজন গ্রাহক বিদ্যুৎ, ফোন, গ্যাস ও পানির বিল পরিশোধ করতে পারেন।

তাছাড়া যথাযথ কর্তৃপক্ষ কারখানা সমূহের শ্রমিকদের বেতন, প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, বয়স্ক ভাতা ইত্যাদি মোবাইল একাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারেন।

বর্তমানে যেখানে দেশের মাত্র ১৩ ভাগ লোক ব্যাংকিং সেবার আওতায় রয়েছে, সেখানে ৫৫ ভাগ লোক মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে। মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংকিং সেবা সম্প্রসারণ করে বিশাল জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং-এর আওতায় নিয়ে আসা যাবে। ফলে অবৈধ পথে টাকা প্রেরণের সকল ব্যবস্থা বন্ধ হবে।

মোবাইল ব্যাংকিং বড় ধরণের লেনদেনের জন্য ব্যবহার করা যায় না। টাকা উঠানো বা জমা দেওয়ার জন্য ব্যাংক একটি সীমা নির্ধারণ করে দেয়। তাছাড়া দিনে কত বার ও সারা মাসে মোট কতবার লেনদেন করা যাবে, তাও ব্যাংক নির্ধারণ করে দেয়। যেমন একজন গ্রাহক একবারে সর্বোচ্চ ৫,০০০/- টাকা উঠাতে বা জমা দিতে পারবেন। তিনি দিনে মোট ৫ বার কিন্তু সারা মাসে ২০ বারের বেশী ঈধংয লেনদেন করতে পারবেন না। এই সীমা নির্ধারণের মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকিং এর ঝুঁকি কমানো সম্ভব হয়।
মোবাইল একাউন্টে প্রতিটি লেনদেনের জন্য গ্রাহক মোবাইল কোম্পানী, ব্যাংক ও এজেন্টকে একটি ফি দিয়ে থাকেন। ফলে মোবাইল ব্যাংকিং বা এম কমার্স গ্রাহকের জন্য সস্তা ব্যাংকিং পদ্বতি নয়। অন্যদিকে ব্যাংকের জন্যও মোবাইল ব্যাংকিং স্থাপন ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার।

বাংলাদেশে ইতোমধ্যে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক ও ব্রাক ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং চালু করেছে। গ্রামের মানুষ ইতোমধ্যেই মোবাইল একাউন্ট খুলে লেনদেন শুরু করে দিয়েছেন। ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং ইতোমধ্যে ২টি আন্তর্জাতিক পুরস্কারও অর্জন করেছে।

৯। ই-কমার্স

ইন্টারনেটের মাধ্যমে জিনিসপত্র ও সেবা ক্রয়-বিক্রয়ের পদ্ধতিকে ই-কমার্স বলে। এই পদ্ধতিতে বিক্রেতা তার ওয়েবসাইটে বিক্রয়যোগ্য সকল দ্রব্যাদি প্রদর্শন করে থাকেন। ক্রেতা বিক্রেতার ওয়েবসাইটে দ্রব্যাদির ছবি, বর্ণনা ও দাম গ্রহনযোগ্য হলে তা ক্রয় করার জন্য নির্বাচন করেন। এভাবে নির্বাচিত সকল দ্রব্যাদি একত্রিত করে ক্রেতার নাম ঠিকানা (যে ঠিকানায় দ্রব্যাদি পাঠাতে হবে) লিপিবদ্ধ করেন (পূর্বেই ক্রেতা রেজিষ্ট্রিকৃত হলে তার প্রয়োজন হয় না)। সবশেষে ক্রয়কৃত মালামালের মূল্য পরিশোধের জন্য "পে" বা "চেক আউট" বাটনে ক্লিক করেন। তারপর ক্রেতা তার ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ডের নাম্বার ও অন্যান্য কোড টাইপ করে মূল্য পরিশোধ করেন।

বিক্রেতার ওয়েবসাইট যে ব্যাংকের সাথে সংযুক্ত, সেটিকে একুয়ারিং (Acruiring) ব্যাংক বলে। ক্রেতা কর্তৃক প্রদত্ত সকল তথ্য প্রথমে এ্যাকুয়ারিং ব্যাংককে যায়। ইস্যুয়িং ব্যাংক (অর্থাৎ যে ব্যাংক ক্রেতার কার্ড প্রদান করেছে) যদি একই ব্যাংক হয়, তবে ঐ ব্যাংক ক্রেতার কার্ড একাউন্ট ডেবিট করে তা বিক্রেতা ও ক্রেতা দুইজনকেই জানায় এবং বিক্রেতার একাউন্ট ক্রেডিট করে। যদি ইস্যুয়িং ব্যাংক ভিন্ন হয়, সেক্ষেত্রে কার্ডটি যে কোম্পানীর (মাস্টার কার্ড, ভিসা, অ্যামেক্স, জেবিসি, ডিনার, ডিসকোভার ইত্যাদি) সেখানে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবে। ঐ কোম্পানী তা ইস্যুয়িং ব্যাংককে পাঠাবে। ইস্যুয়িং ব্যাংক ক্রেতার কার্ড একাউন্ট ডেবিট করে ঐ কোম্পানীর মাধ্যমে এ্যাকুয়ারিং ব্যাংকে জানাবে। সবশেষে এ্যাকুয়ারিং ব্যাংক বিষয়টি ক্রেতা ও বিক্রেতাকে জানাবে। এই ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিতে এ্যাকুয়ারিং ব্যাংক ও বিক্রেতা ইস্যুয়িং ব্যাংক থেকে টাকা পায়, তাকে স্যাটেলম্যান্ট বা নিষ্পত্তি করা বলে।

উল্লেখিত কার্ড কোম্পানীসমূহ এই সব লেনদেন প্রক্রিয়াকরণ ও নিস্পত্তি করার জন্য ইস্যুয়িং ও এ্যাকুয়ারিং ব্যাংক থেকে ফি নিয়ে থাকে। এই সমস্ত ফি এড়ানোর জন্য কোন কোন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গঠিত কোন কোম্পানী "ন্যাশনাল পেমেন্ট গেটওয়ে" স্থাপন করে। ফলে দেশের অভ্যন্তরীন সকল লেনদেন এর মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হয়।

বিক্রেতা যখন তার ব্যাংক থেকে অনুমোদন পেয়ে যান, তখন তিনি ওয়েবসাইটে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে ক্রেতার ঠিকানায় দ্রব্যাদি পাঠিয়ে দেন।

উপরে বর্ণিত ই-কমার্স পদ্ধতিতে কেনাকাটা ছাড়াও বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, ফোন, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এর ফি পরিশোধ করা যায়। তাছাড়া ট্রেন, বাস, উড়োজাহাজ, সিনেমার/নাটকের টিকেট ও হোটেল বুকিংও করা যায়।

তবে যেসব কোম্পানী বা সংস্থার বিল/টিকেট ট্যাক্স ই-কমার্স পদ্ধতিতে পরিশোধ করতে হবে, সেসব সংস্থার একটি ওয়েবসাইট থাকতে হবে এবং গ্রাহকের বিল সংক্রান্ত তথ্যাবলীর একটি ডাটাবেজ থাকতে হবে। গ্রাহক মিটার নম্বর বা ফোন নম্বর বা রোল নম্বর দিয়ে যেন তার প্রদেয় বিলের পরিমান দেখতে পারেন এবং ঐ স্ক্রীণ থেকেই "পে" বাটনে ক্লিক করে উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে বিল পরিশোধ করতে পারেন, তার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এছাড়া, বিল পরিশোধের পর ব্যাংক থেকে অনুমোদন পাওয়ার সাথে সাথে যেন গ্রাহকের প্রদেয় বিল ওয়েবসাইটে পরিশোধিত দেখায়, সে ব্যবস্থাও থাকতে হবে। ২০১১ সাল থেকে DESCO এই পদ্ধতিতে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের "পেমেন্ট গেটওয়ে" ব্যবহার করে বিদ্যুত বিল গ্রহন করছে।

বাংলাদেশে ইতোমধ্যে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক ও ব্রাক ব্যাংক "পেমেন্ট গেটওয়ে" স্থাপন করে ই-মার্চেন্ট হিসাবে দোকান, হোটেল, ইউটিলিটি সংস্থা, বাস-ট্রেন-উরোজাহাজের টিকেট বিক্রি করে এমন কোম্পানী, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি এতে সংযোগ করে যাচ্ছে।

ইমেইল কি?

ইলেকট্রনিক মেইলের সংক্ষিপ্ত রূপ হল ইমেইল যা এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে মানুষ পরস্পর পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করে থাকে। যদিও মূলত এটি একটি টেক্সট বেসড কমিউনিকেশান সিস্টেম কিন্তু প্রযুক্তির আধুনিকায়নের ফলে আজ এর মাধ্যমে এটাচমেন্ট হিসেবে বিভিন্ন ফরমেটের ফাইল, ছবি কিংবা চলমান ভিডিও পাঠানো সম্ভব।

অন্য কথায় বলতে গেলে এটি এমন একটি দ্রুত ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একজন নেটিজেন ইউজার অন্যজন নেটিজেন ইউজারের কাছে নিমিষেই পাঠাতে পারে যে কোন ধরনের ইনফরমেশান।

কেন ইমেইল এত জনপ্রিয়?

একটি নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে মানুষ সরাসরি কিংবা ইন্টারএকটিভ কোন ভয়েস সিস্টেমে যে কোন বিষয়কে যতটানা সাজিয়ে উপস্থাপন করতে পারে তার চাইতে ইমেইলে অনেক ভালোভাবে উপস্থাপন করতে পারে।

তাছাড়া অন্যান্য কমিউনিকেশান সিস্টেমগুলোর তুলনায় এটি একবারেই সস্তা কিন্তু মানসম্পন্ন কমিউনিকেশান সিস্টেম। প্রাপকের সাময়িক অনুপস্থিতি কিংবা ব্যস্ততা এই ইমেইল কমিউনিকশান সিস্টেমে কোন বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারেনা।

ইমেইলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৯৭০ সালের দিকে রে টমলিনসন নেটেনক্স অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে লোকাল ইমেইল সিস্টেম উদ্ভাবন করেন যা SNDMSG এবং READMAIL হিসেবে নামকরন করা হয়। ১৯৭১ এর দিকে তিনি পুনরায় আরপানেট উপযোগী একটি ইমেইল সিস্টেম উদ্ভাবন করেন। তিনই প্রথম ইমেলের প্রাপপকে চিহ্নিত করার জন্য @ সিম্বল ব্যবহার করেন যা বর্তমান ইমেইল সিস্টেমে ব্যবহার হয়ে থাকে।

এর পরবর্তি সময় থেকে ক্রমান্বয়ে MAIL, MLFL, RD, NRD, WRD, MSG, MMDF ও Send Mail সহ বিভিন্ন মেইলিং সিস্টেম ও স্টান্ডার্ড উদ্ভাবিত হয়।

কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং

কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং (নেটওয়ার্ক) হলো হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্ট ও কম্পউটারের সমষ্টি যা কমিউনিকেশন চ্যানেল এর মাধ্যমে ইন্টারকানেক্টেড থাকে এবং বিভিন্ন তথ্য ও রিসোর্স শেয়ার অনুমোদন করে। নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে দুরবর্তী যে কোন কম্পিউটারে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়। কম্পিউটার নেটওয়ার্কিংকে অনেক সময় দূরসঞ্চারের (টেলিযোগাযোগ) বিভাগ বলে ধরা হয়ে থাকে।

কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং: ইতিহাস

শুরুর দিকে একাধিক কম্পিউটারের মধ্যে তথ্য আদানপ্রদানের কাজ মানুষই করত। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে জর্জ স্তিবলিৎজ প্রথম একটি দূরসঞ্চার যন্ত্র ব্যবহার করেন নিউ হ্যাম্পস্যার এর ডর্টমাউথ কলেজ থেকে নিউইয়র্কে তাঁর জটিল সংখ্যা গননার যন্ত্রের মধ্যে সংযোগস্থাপনের জন্যে। ১৯৬৪ সালে ডর্টমাউথ এক বিশাল কম্পিউটার ব্যবস্থার বিতরিত ব্যবহারকারীদের জন্য একটি সময় বিভক্তিকরন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করে। ওই একই সালে জেনারেল ইলেক্ট্রিক ও বেল ল্যাবরেটরির সাহায্যপ্রাপ্ত কিছু গবেষক একটি পিডিপি-৮ কম্পিউটারকে ব্যবহার করেন টেলিফোন সংযোগকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন করার জন্য। ১৯৬৯ সালে লস এঞ্জেলস এর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, স্ট্যানফোর্ডের এস আর আই, সান্তা বারবারার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও উতা বিশ্ববিদ্যালয় আরপানেট এর মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে ৫০ কেবিপিএস (কিলোবিট প্রতি সেকেন্ডে) গতিতে সংযোগ স্থাপন করে।

নেটওয়ার্ক কি?

একটি কম্পিউটার যখন এক বা একাধিক কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত হয়ে তথ্য আদানপ্রদান করে তখন থাকে নেটওর্য়াক বলে। নেটওর্য়াক করার জন্য ন্যূনতম দুটি কম্পিউটার প্রয়োজন।

নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ :

নেটওয়ার্কে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

1. LAN
2. MAN
3. WAN

Local Area Network (LAN): একই বিল্ডিং এর মাঝে অবস্থিত বিভিন্ন কম্পিউটার নিয়ে গঠিত নেটওয়ার্রকে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বলে। এই নেটওয়ার্ক এর ডাটা ট্রান্সফার গতি ১০এমবিপিএস। এই নেটওয়ার্ক এ ব্যবহিত ডিভাইসগুলো হলো রিপিটার, হাব, নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস ইত্যাদি।

Metropolitan Area Network (MAN): একই শহরের মধ্যে অবস্থিত কয়েকটি ল্যানের সমন্বয়ে গঠিত ইন্টারফেসকে বলা হয় মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক । এ ধরনের নেটওয়ার্ক ৫০-৭৫ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। এই নেটওয়ার্কর ডাটা ট্রান্সফার স্পিড গিগাবিট পার সেকেন্ড। এ ধরনের নেটওয়ার্ক এ ব্যবহিত ডিভাইস গুলো হলো রাউটার, সুইজ, মাইক্রোওয়েভ এন্টেনা ইত্যাদি।

WAN (Wide Area Network): দূরবর্তী ল্যানসমূকে নিয়ে গড়ে উঠা নেটওয়ার্ককে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক বলে। এ ধরনের নেটওয়ার্ক এর ডাটা ট্রান্সফার স্পীড ৫৬ কেবিপিএস থেকে ১.৫৪৪ এমবিপিএস। ওয়্যানের গতি ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে। এ ধরনের নেটওয়ার্কে ব্যবহিত ডিভাইসগুলো হলো রাউটার, মডেম, ওয়্যান সুইজ ইত্যাদি।

টপোলজি :

একটি নেটওয়ার্কে কম্পিউটারগুলো কিভাবে সংযুক্ত আছে তার ক্যাটালগকেই টপোলজি বলে । নেটওয়ার্ক ডিজাইনের ক্ষেত্রে টপোলজি বিশেষ ভূমিকা রাখে। টপোলজি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন- বাস টপোলজি, স্টার টপোলজি, রিং টপোলজি,মেশ টপোলজি ইত্যাদি। নীচে বিভিন্ন টপোলজিগুলো দেওয়া হলো:

নেটওয়ার্ক ক্যাবল :

এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারের ডাটা পাঠানোর জন্য যে ক্যাবল ব্যবহার করা হয় থাকেই নেটওয়ার্ক ক্যাবল বলে ।

নেটওয়ার্কিং করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্যাবল ব্যবহার করা হয় । যেমন:

1. কোএক্সিয়াল ক্যাবল
2. ট্যুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল
3. ফাইবার অপটিক ক্যাবল
4. প্যাচ ক্যাবল
5. ইন্টারনেট ক্রসওভার ক্যাবল

রিপিটার

রিপিটার হলো এমন একটি ডিভাইস যা সিগন্যালকে এমপ্লিফাই করার জন্য ব্যবহার করা হয়। ১৮৫ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করার আগেই আপনি একটি রিপিটার ব্যবহার করে সেই সিগন্যালকে এমপ্লিফাই করে দিলে সেটি আরো ১৮৫ মিটার অতিক্রম করতে পারে। এটি কাজ করে ওএসআই মডেল এর ফিজিক্যাল লেয়ারে।

হাব

হাব হলো একাধিক পোর্ট বিশিষ্ট রিপিটার। এটি কাজ করে ইলেকট্রিক সিগন্যাল নিয়ে। নেটওয়ার্ক এড্রেস কিংবা নেটওয়ার্ক এডাপ্টারের ম্যাক এড্রস নিয়ে হাবের মাথাব্যাথা নেই। এটিও কাজ করে ওএসআই মডেল এর ফিজিক্যাল লেয়ারে।

ব্রিজ

ব্রিজ এমন একটি ডিভাইস যা একাধিক নেটওয়ার্ক সেগমেন্টকে যুক্ত করে থাকে। এটি প্রতিটি সেগমেন্ট বিভিন্ন ডিভাইসের হিসেব রাখার জন্য ব্রিজিং টেবিল তৈরি করে। ইহা ওএসআই মডেল এর ডাটালিংক লেয়ারে কাজ করে।

সুইজ

সুইজ হলো একাধিক পোর্ট বিশিষ্ট ব্রিজ।ইহা প্রতিটি নোডের ম্যাক এড্রেস এর তালিকা সংরক্ষন করে। ইহা ওএসআই মডেল এর ডাটালিংক লেয়ারে কাজ করে।

রাউটার

এক নেটওয়ার্ক থেকে আরেক নেটওয়ার্কে ডাটা পাঠানোর পদ্ধতিকে বলা হয় রাউটিং। আর রাউটিং এর জন্য ব্যবহৃত ডিভাইস হলো রাউটার। ইহা ওএসআই মডেল এর নেটওয়ার্ক লেয়ারে কাজ করে।

গেটওয়ে

বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কসমূহকে যুক্ত করার জন্য ব্যবহিত ডিভাইসটি হলো গেটওয়ে। ইহা প্রটোকলকে ট্রান্সলেশন করে থাকে। ইহা ওএসআই মডেল এর ৭ লেয়ারেই কাজ করে।

ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক বা ভিপিএন

ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক বা ভিপিএন হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যাতে গ্রাহক ইন্টারনেট কে কাজে লাগিয়ে একটি প্রাইভেট নেটওয়ার্ক থেকে ডেটা ট্রাফিক দূরবর্তী অন্য একটি প্রাইভেট নেটওয়ার্কে পাঠিয়ে দিতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান গুলো বিপুল অংকের অর্থ সাশ্রয় করতে পারে। ভিপিএন বা ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্কের সংগা কোন কোন ব্যক্তি এই ভাবে দিয়ে থাকেন:

ভিপিএন হচ্ছে একটি প্রাইভেট নেটওয়ার্ক যা টেলিফোন সার্ভিস প্রোভাইডার প্রদত্ত পাবলিক সুইচড সার্কিট এর মাধ্যমে কাজ করে এবং ডেটা প্যাকেট পরিবহনের সময় সম্মিলিত ভাবে প্যাকেট টানেলিং অথেনটিকেশন এবঙ ডেটা এনক্রিপশন প্রটোকল ইত্যাদি কৌশল ব্যবহার করে।

তবে কোন ডায়ালআপ সংযোগ বা রিমোট অ্যাকসেস সংযোগ ডেটা ট্রাফিকের মাধ্যম হিসেবে যদি ইন্টারনেট বা অন্য কোন প্রোভাইডারের ব্যবস্থাপনায় চালিত নেটওয়ার্ক ব্যবহৃত হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে ভিপিএন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে বলে ধরে নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো যে, ইন্টারনেট ডেটা প্রবাহের বেলায় খুব বেশি নিরাপত্তা প্রদান করতে পারে না। কিন্তু ভিপিএন সমাধানে ডেটা ট্রাফিকের নিরাপত্তা বিষয়টি কে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। এছাড়া ডেটার সুরক্ষায় ভিপিএন বিশেষ প্রটোকল ব্যবহার করে থাকে।

ফায়ারওয়াল (কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং)

FIREWALL বাইরের আক্রমণ থেকে এক বা একাধিক কম্পিউটার কে রক্ষা করার জন্য হার্ডওয়্যার আর সফটওয়্যার এর মিলিত প্রয়াস। ফায়ারওয়াল এর সবচেয়ে বহুল ব্যবহার লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এর ক্ষেত্রে। তথ্য নিরাপত্তা রক্ষাও এর কাজের অংশ। ফায়ার ওয়াল হল এক বিশেষ নিরাপত্তা ব্যাবস্থা জাতে এক নেটওয়ারক থেকে আরেক নেটওয়ারকে ডাটা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। দুই নেটওয়ারকের মাঝে এই ফায়ারওয়াল থাকে। জাতে এক নেটওয়ারক থেকে আরেক নেটোয়ারকে কোনো ডাটা পরিবাহিত হলে সেটিকে অবশ্যয় ফায়ারওয়াল অতিক্রম কোরতে হয়। ফায়ারওয়াল তার নিওন অনুসারে সেই ডাটা নীরিক্ষা করে দেখে এবং যদি দেখে জে সে ডাটা ওই গন্তব্যে জাওয়ার অনুমতি আছে তাহলে সেটিকে জেতে দেয়। আর তা না হলে সেটিকে ওখানে আটকে রাখে বা পরিত্যাগ করে। vccvসিস্কো রাউটারেই এখন বিল্ট -ইন সিস্কো ios ফায়ারওয়াল পাওয়া যায়।

ওয়াই ফাই

ওয়াই ফাই হল ওয়াই ফাই এলায়েন্সের বাণিজ্য-চিহ্ন বা ট্রেডমার্ক । আই ই ই ই ৮০২.১১ আদর্শের তারহীন স্থানীয় এলাকা নেটওয়ার্ক বা অয়্যারলেস লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ডব্লিউ এল এ এন) ডিভাইস ব্র্যান্ড করার জন্য উৎপাদনকারীরা এই বাণিজ্য-চিহ্ন ব্যবহার করে। এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ডব্লিউ এল এ এন ক্লাশ হল আই ই ই ই ৮০২.১১। ওয়াই ফাই শব্দটি প্রায়ই আই ই ই ই ৮০২.১১ এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ওয়াই ফাই এলায়েন্স হল একটি বিশ্বব্যপী প্রতিষ্ঠানের দল যা ডব্লিউ এল এ এন প্রযুক্তি বিস্তার করে এবং ইন্টেরোপেরাবিলিটির আদর্শ সমন্বিত ডিভাইসকে প্রত্যয়ন করে। ইন্টেরোপেরাবিলিটি হল তথ্য বিনিময় ও ব্যবহার করার ক্ষমতা। অনেক সময় খরচ কমানোর জন্য সকল ৮০২.১১-উপযোগী ডিভাইস ওয়াই ফাই এলায়েন্স প্রত্যয়নের জন্য দেয়া হয় না। কোন ডিভাইসে ওয়াই ফাই লগো না থাকে মানে এই না যে ডিভাইসটি ওয়াই ফাই সমর্থন করে না।

সাধারণত সকল ল্যাপ্টপ, পেরিফেরাল ডিভাইস, প্রিন্টার, স্মার্ট ফোন, এম পি থ্রী প্লেয়ার, ভিডিও গেম কনসোল এবং ব্যক্তিগত কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায়।

ওয়েব ব্রাউজার

ওয়েব ব্রাউজার হলো এমন একটি সফটওয়্যার যার মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী যেকোনো ওয়েবপেইজ, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে অথবা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে অবস্থিত কোনো ওয়েবসাইটের যেকোনো লেখা, ছবি এবং অন্যান্য তথ্যের অনুসন্ধান, ডাউনলোড কিংবা দেখতে পারেন। কোনো ওয়েবসাইটে অবস্থিত লেখা এবং ছবি একই অথবা ভিন্ন ওয়েবসাইটের সাথে আন্তসংযুক্ত (হাইপারলিঙ্কড) থাকলে একটি ওয়েব ব্রাউজার একজন ব্যবহারকারীকে দ্রুত এবং সহজে এইসকল লিঙ্কের মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে অবস্থিত অসংখ্য ওয়েবপেইজের সাথে তথ্য আদান-প্রদানে সাহায্য করে। এভাবে ওয়েবপেজের ভিতরকার লেখা, ছবি, ভিডিও ইত্যাদির মধ্যে চলাচল করাকে ব্রাউজিং বলে।

ব্যক্তিগত কম্পিউটারের জন্য বিদ্যমান উল্লেখযোগ্য ওয়েব ব্রাউজারের মধ্যে আছে মাইক্রোসফট ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, মোযিলা ফায়ারফক্স, অ্যপেল সাফারি, নেটস্কেপ এবং ওপেরা (আগস্ট ২০০৬ নাগাদ বিশ্বব্যাপী তাদের জনপ্রিয়তার অধঃক্রম অনুযায়ী) প্রভৃতি।

হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ (এইচটিএমএল)

হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ (অথবা এইচটিএমএল, ইংরেজি: Hyper Text Markup Language) হলো একটি ফর্ম্যাট যাতে বিভিন্ন প্রকারের ফর্ম্যাটিং ও হাইপারলিংক ব্যবহার করা যায়। ইন্টারনেটে, তথা ওয়েবসাইটে এইচ টি এম এল সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। এই ফাইলের এক্সটেনশন .htm অথবা .html উভয়ই হতে পারে। এতে বিভিন্ন ট্যাগ ব্যবহার করে বিভিন্ন ফর্ম্যাটিং, অবজেক্ট ও লিংক প্রকাশ করা করা হয়। html এর সর্বশেষ ভার্সন হলো html 5 যার উন্নয়ন কাজ এখনো অসম্পূর্ণ। html 5 এ ওয়েবসাইটে অডিও,ভিডিও যোগ করার জন্য নতুন আদর্শ(স্ট্যান্ডার্ড) যোগ করা হয়েছে।

ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (WWW)

ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (সংক্ষিপ্তরূপ দি ওয়েব) হল ইন্টারনেট দিয়ে দর্শনযোগ্য আন্তঃসংযোগকৃত তথ্যাদির একটি ভাণ্ডার। একটি ওয়েব ব্রাউজারের সহায়তা নিয়ে একজন দর্শক ওয়েবপাতা বা ওয়েবপেজ দেখতে পারে এবং সংযোগ বা হাইপারলিঙ্ক ব্যবহার করে নির্দেশনা গ্রহণ ও প্রদান করতে পারে।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে যুক্ত হাইপার টেক্সট ডকুমেন্টগুলো নিয়ে কাজ করার পক্রিয়ায় ওয়াল্ড ওয়াইড ওয়েব নামে পরিচিত। হাইপার লিংকের সাহায্যে ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে, ওয়েব পেইজ দেখা যায়, যা টেক্সট, চিত্র, ভিডিও ও অন্যান্য মাল্টিমিডিয়া সমৃদ্ধ হতে পারে। ১৯৮৯ সালের মার্চে ইংরেজ পদার্থবিদ টিম বার্নাস লি, বর্তমানে যিনি ওয়ার্ণ্ড ওয়েব কনসোর্টিয়ামের ডাইরেক্টর, পূর্ববর্তী হাইপারটেক্সট সিস্টেম হতে ধারণা নিয়ে, যে প্রস্তাবনা লেখেন তা হতেই উপত্তি ওয়াল্ড ওয়াইড ওয়েবের। পরবর্তীতে এ কাজে লি'র সাথে যোগ দেন বেলজিয়ান বিজ্ঞানী রবার্ট কাইলিয়াউ। এসময় তারা উভয়েই সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় সের্নে কর্মরত ছিলেন। ১৯৯০ এর ডিসেম্বরে তাদের প্রকাশিত এক প্রস্তাবনায় তারা উল্লেখ করেন," হাইপারটেক্সট্-কে লিংক ও ওয়েব হতে নানবিধ তথ্যের সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে একজন ব্যবহারকারি তার মর্জিমাফিক ওয়েব পরিভ্রমণ করতে পারবে।"

বর্তমান ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে, অন্যান্য ওয়েব সাইট তৈরি হয়েছিল, সারা বিশ্বব্যাপী, ডোমেইন এর নাম ও এইচটিএমল এর ক্ষেত্রে আর্ন্তজাতিক মান স্থাপিত হয়েছিল। তখন থেকেই বার্নাস লি ওয়েব স্টান্ডার্ড এর ব্যাপারে তার সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন(যেমন, ওয়েব পেইজ তৈরীতে কোন মার্কআপ ভাষা ব্যবহার করা হবে)। সাম্প্রতিক কালে তিনি আওয়াজ তুলেছেন Semantic ওয়েব এর ব্যাপারে। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব সহজে ব্যবহার যোগ্য ও সাবলীল পক্রিয়ায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য সমূহের প্রসার বা বিস্তৃতি ঘটিয়েছে। আর এভাবেই তারা ইন্টারনেটকে জনপ্রিয় করতে গুরুত্ববহ ভূমিকা রেখেছেন। অনেক সময় সাধারণত এদের অর্থকে গুলিয়ে ফেলা হয় যদিও ইন্টারনেট কখনই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের প্রতিশব্দ নয়। ওয়েব হল মূলত ইন্টারনেটের উপর ভিত্তিকরে গড়ে ওঠা একটা এপ্লিকেশন মাত্র।

ওয়েব যেভাবে কাজ করে

ওয়েব পেজ দেখার প্রক্রিয়া সাধারণত কোন ব্রাউজারে ইউআরএল টাইপ করা বা কোন পাতা হতে হাইপারলিঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমে শুরু হয়ে থাকে। এরপর ওয়েব ব্রাউজার যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে কিছু বার্তা প্রদান শুরু করে। এর ফলশ্রুতিতে পরিশেষে পাতাটি দর্শনযোগ্য হয়ে ওঠে।

প্রথমেই ইউআরএল এর সার্ভার নামের অংশটি আইপি এ্যাড্রেস ধারণ করে। এজন্য এটি একটি বিশ্বজনীন ইন্টারনেট ডাটাবেস বা তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার করে যা ডোমেইন নেম সিস্টেম নামে পরিচিত। এই আইপি ঠিকানাটি ওয়েব সার্ভারে ডাটা প্যাকেট প্রেরণের জন্য জরুরী।

এরপর ব্রাউজার নির্দিষ্ট ঠিকানাটিকে একটি এইচটিটিপির আবেদন জানায় ওয়েব সার্ভারের কাছে। সাধারণ কোন ওয়েব পেজের বেলায়, পাতাটির এইচটিএমএল লেখার জন্য শুরুতে আবেদন জানানো হয়। এরপর ওয়েব ব্রাউজারটি ছবিসহ অন্যন্য প্রয়োজনীয় ফাইলের জন্য আবেদন পৌছে দেয়।

ওয়েব সার্ভার থেকে আবেদনকৃত ফাইলসমূহ পাবার পর ওয়েব ব্রাউজারটি এইচটিএমএল, সিএসএস ও অন্যান্য ওয়েব ল্যাঙ্গুয়েজ অনুযায়ী পাতাটিকে স্ক্রিনে সাজিয়ে ফেলে। অধিকাংশ ওয়েব পাতাগুলোতে নিজস্ব হাইপারলিঙ্ক থাকে যাতে সংশ্লিষ্ট অন্যন্য পাতা এবং ডাউনলোডসহ অন্যন্য প্রয়োজনীয় লক্ষ্য উল্লেখিত থাকে। এই প্রয়োজনীয় ও পরস্পর সংযুক্ত হাইপারলিঙ্কগুলোর সমুষ্টিই ওয়েব নামে পরিচিত। টিম বার্নার্স-লি সর্বপ্রথম একে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব নামে নামাঙ্কিত করেন।

URL

ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর (URL) ইন্টারনেটে একটি নথি অথবা একটি সার্ভারের ঠিকানা প্রদর্শন করে। একটি ইউআরএলের সাধারণ কাঠামো টাইপ কর অনুসারে পরিবর্তন করে এবং আকার পরিষেবাতে সাধারণত: //Hostname:Port/Path/Page#Mark যদিও সমস্ত উপাদান সবসময় প্রয়োজন বোধ করা হয় না। একটি URL একটি FTP ঠিকানা, একটি WWW (HTTP) ঠিকানা, একটি ফাইল ঠিকানা অথবা একটি ই-মেইল ঠিকানা।

HTTP

হাইপারটেক্সট স্থানান্তর প্রোটোকলটি হলো WWW সার্ভারের (আয়োজক) এবং ব্রাউজার (ক্লায়েন্ট) এর মধ্যে WWW নথির প্রেরণের একটি রেকর্ড ।

FTP

FTP ফাইল স্থানান্তর প্রোটোকলের জন্য দাঁড়ায় এবং ইন্টারনেটে ফাইলের জন্য প্রমাণ স্থানান্তর প্রোটোকল। একটি FTP সার্ভার ইন্টারনেটে একটি গণক যন্ত্রে একটি অনুষ্ঠান সংযোগ করে হতে যেটি জমিয়ে রাখে ফাইল FTP এর সাহায্যের সঙ্গে প্রেরণ কর। FTP এর সময় এবং ডাউনলোড ইন্টারনেট ফাইল, প্রেরণ করার জন্য দায়িত্বশীল HTTP (Hypertext স্থানান্তর প্রোটোকল) সংযোগ ব্যবস্থাপনা জোগান দেয় এবং ডাটা WWW সার্ভার এবং ক্লায়েন্টের মধ্যে স্থানান্তর করে।

ডাটা স্টোরেজঃ

ডাটা স্টোরেজ বলতে ডাটা জমা(store) রাখার বিভিন্ন উপায়কে বোঝায়। হার্ড-ড্রাইভস, ফ্ল্যাশ মেমরি, অপ্টিকাল মিডিয়া এবং অস্থায়ী র‍্যাম স্টোরেজ এর অর্ন্তভুক্ত। নির্দিষ্ট কোন ডাটা স্টোরেজ পছন্দ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জিনিসের প্রতি খেয়াল রাখতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, যেসব ডাটা নিয়মিত আদান-প্রদান কিংবা পরিবর্তন করা হবে সেগুলো হার্ড-ড্রাইভ বা ফ্ল্যাশ মেমরিতে রাখা ভালো। কারণ এধরণের মিডিয়া দ্রুত ডাটায় প্রবেশ এবং প্রয়োজনমত ডাটা সরানো বা পরিবর্তন করার সুযোগ আছে। আবার আর্কাইভ ডাটা মুলত অপ্টিকাল মিডিয়ায়(যেমনঃ সিডি বা ডিভিডি) জমা করার সুযোগ রয়েছে। কারণ এধরণের ডাটা পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। এছাড়া অপ্টিকাল ডিস্কে ডাটার দীর্ঘস্থায়ীতা হার্ড-ড্রাইভের থেকেও বেশি হওয়ার আর্কাইভের ক্ষেত্রে এটিই বেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে

ডাটা সিকিউরিটিঃ

ডাটা সিকিউরিটি বলতে কম্পিউটারের ডাটাকে রক্ষা করাকে বোঝায়। অনেকে নিজস্ব কিংবা বিজনেস সংক্রান্ত মূল্যবান তথ্য তাদের কম্পিউটারে জমা করে রাখে। তাই এসব তথ্যের গোপনীয়তা এবং অখন্ডতা রক্ষার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া উচিত। যেমনঃ মূল কয়েকটি পদক্ষেপের মধ্যে প্রথমত, কম্পিউটারে একটি ফায়ারওয়াল ইন্সটল করা থাকতে হবে যাতে অননুমোদিত কেউ কম্পিউটারে ঢুকতে না পারে। দ্বিতীয়ত, অনলাইনের মাধ্যমে ব্যাক্তিগত ডাটা শেয়ারের সময় এনক্রিপশন করে করা উচিত। তৃতীয়ত, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে প্রয়োজনীয় সমস্ত ডাটার ব্যাক-আপ রাখা যাতে প্রাইমারী স্টোরেজ ডিভাইস কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেলে যেসব ডাটা উদ্ধার করা যায়।

কম্পিউটার ভাইরাস কি?

কম্পিউটার ভাইরাস হল এক ধরণের কম্পিউটার প্রোগ্রাম যা ব্যবহারকারীর অনুমতি বা ধারণা ছাড়াই নিজে নিজেই কপি হতে পারে। একটি ভাইরাস এক কম্পিউটার থেকে অপর কম্পিউটারে যেতে পারে কেবলমাত্র যখন আক্রান্ত কম্পিউটারকে স্বাভাবিক কম্পিউটারটির কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

ভাইরাস আক্রমনের কুফল কি কি ?

- পিসি স্লো হয়ে যাওয়া
- হাং এর সমস্যা হওয়া
- ডাটা নষ্ট হওয়া,
- তথ্য চুরি হওয়া
- হার্ড ডিস্ক এর জায়গা দখল হওয়া
- অবাঞ্ছিত মেসেজ দেখানো
- কম্পিউটার ওপেন হতে সময় নেয়া
- এরর রিপোর্ট দেখানো
- ফাইল নষ্ট হয়ে যাওয়া
- ইন্টারনেট স্লো হয়ে যাওয়া
- টাস্ক ম্যানেজার কাজ না করা
- কন্ট্রোল প্যানেল কাজ না করা ইত্যাদি ।

হ্যাকিং কি?

হ্যাকিং একটি প্রক্রিয়া যেখানে কেউ কোন বৈধ অনুমতি ছাড়া কোন কম্পিউটার বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে প্রবেশ করে। যারা এ হ্যাকিং করে তারা হচ্ছে হ্যাকার। এসব কথা তোমরা প্রায় সবাই জান। আমরা প্রায় সবাই জানি হ্যাকিং বলতে শুধু কোন ওয়েব সাইট হ্যাকিং আবার অনেকের ধারনা হ্যাকিং মানে শুধু কম্পিউটার বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হ্যাক করা, আসলে কি তাই? না আসলে তা না। হ্যাকিং অনেক ধরনের হতে পারে। তোমার মোবাইল ফোন, ল্যান্ড ফোন, গাড়ি ট্র্যাকিং, বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক্স ও ডিজিটাল যন্ত্র বৈধ অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করলে তা ও হ্যাকিং এর আওতায় পড়ে। হ্যাকাররা সাধারনত এসব ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রের ত্রুটি বের করে তা দিয়েই হ্যাক করে।

হ্যাকার কে বা কি?

যে ব্যাক্তি হ্যাকিং practice করে তাকেই হ্যাকার বলে। এরা যে সিস্টেম হ্যাকিং করবে ঐ সিস্টেমের গঠন, কার্য প্রনালী, কিভাবে কাজ করে সহ সকল তথ্য জানে। আগে তো কম্পিউটারের এত প্রচলন ছিলনা তখন হ্যাকার রা ফোন হ্যাকিং করত। ফোন হ্যকার দের বলা হত Phreaker এবং এ প্রক্রিয়া কে বলা হ্য Phreaking । এরা বিভিন্ন টেলিকমনিকেশন সিস্টেমকে হ্যাক করে নিজের প্রয়োজনে ব্যাবহার করত। চিহ্নিত করা হয় Hat বা টুপি দিয়ে।

তিন প্রকারের হ্যকার রয়েছেঃ

- White hat hacker
- Grey hat hacker
- Black hat hacker

ইন্টারনেট

আন্তর্জাল বা ইন্টারনেট (ইংরেজি: Internet ইন্‌টার্‌নেট্‌) হল সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত, পরস্পরের সাথে সংযুক্ত অনেকগুলো কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সমষ্টি যা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত এবং যেখানে আইপি বা ইন্টারনেট প্রটোকল নামের এক প্রামাণ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে ড্যাটা আদান-প্রদান করা হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অনেকে ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবকে সমার্থক শব্দ হিসেবে গণ্য করলেও প্রকৃতপক্ষে শব্দদ্বয় ভিন্ন বিষয় নির্দেশ করে।

ইন্টারনেট ইন্টারনেট্‌ওয়ার্ক(internetwork) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটা বিশেষ গেটওয়ে বা রাউটারের মাধ্যমে কম্পিউটার নেটওয়ার্কগুলো একে-অপরের সাথে সংযোগ করার মাধ্যমে গঠিত হয়। ইন্টারনেটকে প্রায়ই নেট বলা হয়ে থাকে। যখন সম্পূর্ণ আইপি নেটওয়ার্কের আন্তর্জাতিক সিস্টেমকে উল্লেখ করা হয় তখন ইন্টারনেট শব্দটিকে একটি নামবাচক বিশেষ্য মনে করা হয়।

ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব দৈনন্দিন বক্তৃতায় প্রায়ই কোন পার্থক্য ছাড়া ব্যবহৃত হয়। যাইহোক, ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব একই নয়। ইন্টারনেটের হার্ডওয়্যার এবং সফ্টওয়্যার পরিকাঠামো কম্পিউটারসমূহের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করে। বিপরীতে, ওয়েব ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রদত্ত পরিষেবাগুলির একটি। এটা পরস্পরসংযুক্ত কাগজপত্র এবং অন্যান্য সম্পদ সংগ্রহের, হাইপারলিংক এবং URL-দ্বারা সংযুক্ত।

ইন্ট্রানেট ও এক্সট্রানেট

একটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীন যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত নেটওয়ার্ক সিস্টেমকে ইন্ট্রানেট বলা হয়। যা কেবল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা ব্যবহার করতে পারে। ইন্টারনেটে যে কেউ প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু ইন্ট্রানেটে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মী ব্যতীত আর কারো প্রবেশাধিকার থাকে না। ধরা যাক একটি বৃহৎ কোম্পানী যার আফিস দেশের বিভিন্ন বিভাগীয় সদরে এবং দেশের বাইরে আরো কয়েকটি দেশব্যাপী বিস্তৃত । এই কোম্পানী প্রতিটি অফিসেই ল্যান রয়েছে এবং দেশে ও দেশের বাইরে এই ল্যানগুলো একটি আরেকটির সাথে যুক্ত। এই ধরনের ল্যানকে ওয়ান বলা হয়।তবে পার্থক্য হচ্ছে, এই ওয়ানের একটি অংশ বা রিসোর্স (যেমন-আর্থিক হিসাব, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায়িক কৌশল ইত্যাদি) অত্যন্ত সুরক্ষিত থাকে। পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে শুধু কোম্পানীর নিজস্ব লোকজন এসব রিসোর্স ব্যবহার করতে পারে।কোম্পানীর সুরক্ষিত রিসোর্সসংবলিত এই নেটওয়ার্ক অংশটিকে বলা হয় ইন্ট্রানেট(Intranet)। ইন্টারনেটের মতোই সম্প্রতি ইন্ট্রানেটও ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কোন কোম্পানির ওয়ানের একটি নির্দিষ্ট অংশ বা এর রিসোর্স সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকতে পারে। এসব উন্মুক্ত রিসোর্সের মধ্যে থাকতে পারে কোম্পানী প্রোফাইল, প্রজেক্ট এবং প্রোগ্রাম, শেয়ার স্ট্যাটাস, বাৎসরিক প্রতিবেদন ইত্যাদি।কোম্পানীর ওয়েব সাইটের মাধ্যমে সাধারণ ইউজাররা এসব তথ্য দেখতে পারে বা ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করতে পারে। ওয়ানের এ ধরনের উন্মুক্ত অংশকে বলে।

IP address বা Internet Protocol (IP) address

ইন্টারনেট প্রটোকল অ্যাড্রেস বা ইন্টারনেট প্রটোকল ঠিকানা (IP address বা Internet Protocol (IP) address) হল একটি সংখ্যাগত লেবেল যা কোন কম্পিউটার নেটওয়ার্কে যুক্ত প্রতিটি কৌশল বা ডিভাইসের জন্য নির্ধারিত যেখানে নেটওয়ার্কের নোড গুলো যোগাযোগের জন্য ইন্টারনেট প্রটোকল ব্যবহার করে ।[১] ইন্টারনেট প্রটোকল অ্যাড্রেসের প্রধান কাজ মুলত দুটি:হোস্ট অথবা নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস সনাক্ত করা এবং অবস্থান খুজে বের করা।

টিসিপি/আইপি পরিকল্পনাকারীরা ইন্টারনেট প্রটোকল ঠিকানাকে ৩২বিটের নম্বর দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন এবং এই পদ্ধতিটি ইন্টারনেট প্রটোকল ভার্সন ৪ নামে পরিচিত যা এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে।তবে ইন্টারনেটের ব্যবহার অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যাওয়ায় এবং অব্যবহৃত অ্যাড্রেস দিন দিন কমতে থাকায় ১৯৯৫ সনে [২] নতুন একটি অ্যাড্রেসিং পদ্ধতি(আইপিভি৬) চালু করা হয় যেখানে প্রতিটি অ্যাড্রেসকে প্রকাশ করার জন্য ১২৮বিট নম্বর ব্যবহৃত হয় এবং পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে আরফসি ২৪৬০ এ তা মানোপযোগী করা হয়।[৩] ইন্টারনেট প্রটোকল অ্যাড্রেস গুলোকে স্টোর করার জন্য বাইনারী নম্বর পদ্ধতি ব্যবহার করা হলেও এটি প্রকাশ করার জন্য সাধারণত মানুষের পঠনযোগ্য সঙ্কেতে ব্যবহার করা হয়,উদাহরণ স্বরুপ বলা যায়,180.210.130.13(আইপিভি৪) এবং 2001:db8:0:1234:0:567:1:1(আইপিভি৬)।